Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 35-45
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

খাদ্য সমস্যার অভিঘাতে মহাশ্বেতা দেবীর 'বান' ও 'ভাত' গল্প : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

সুব্রত রায়
সহকারি অধ্যাপক, বঙ্গাইগাঁও কলেজ, বঙ্গাইগাঁও, আসাম

Abstract

In the decade of the 1970s the famous litterateur Mahasweta Devi's (1926-2016) literary works on down trodden sections gave society a view of their struggle with poverty, oppression, atrocities and hunger i.e basic needs. She not only wrote but as a mother fought for them through out her life.

In our country, till today food crisis is a big problem. There are many poor souls who find it hard to get even a morsel of grain for their survival and their outcry still remain unheard. It is then through the pens of the writers like Mahasweta Devi that comes alive the outcry to save these poverty stricken, outcast sections of the society. That's why her stories were named- 'Bhaat', 'Jal', 'Ghar', 'Nun' etc. She had seen the struggles and felt their sorrows by living with these poor sections of the society and subaltern people. She once with a heavy heart told that even after so many years of independence we have not got freedom from beggary, casteism, poverty. Through her writings she tried to bring to light their plights of sorrow and problem of these voiceless sections of the Indian society.

Out of her many literary works involving the food (rice) crisis here selected stories like 'Baan' & 'Bhaat' will be explored so as to bring awareness, consciousness for eliminating those evils from our society for good.

Key Words: Subaltern, Voiceless, Food Crisis, Rice, Problem, Struggle, Awareness.

বিশ শতকের অপ্রতিরোধ্য চেতনার অধিকারী মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬- ২০১৬)-র নাম বাংলা সাহিত্যের আসরে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গেই স্মরণীয়। কল্লোলের একজন সুবিখ্যাত কবি মনীশ ঘটক যাঁর পিতা; ঋত্বিক ঘটকের মতো ভারতের চলচ্চিত্র জগতের এক ব্যতিক্রমী ও স্বনামধন্য প্রাণপুরুষ যাঁর কাকা; প্রতিভাবান নবনাট্য আন্দোলনের হোতা বিজন ভট্টাচার্য যাঁর স্বামী তাঁর মতো রমণীর পারিবারিক গরিমাই শুধুই নয় ___ বরং তাঁর অসামান্য গুণান্বিত প্রতিভা, দরদী মনের অধিকারিণীরূপ ব্যক্তিত্ব, নিরলস কর্মমুখরতা, ক্লান্তিহীন ও বিরামহীন অধ্যবসায় তাঁকে খ্যাতির চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল মন্ত্রই ছিল মানুষের প্রতি অপরিসীম ও সুগভীর মমতা তথা ভালোবাসা ও সহানুভূতিসম্পন্ন স্নেহপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এই মহাশ্বেতা দেবী। তিনি একটি স্বচ্ছ, শোষণহীন এবং সমানাধিকার প্রাপ্ত শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই নিম্নবর্গীয় সমাজের চিত্ররূপ অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র তাদের নীরব আবেদনকেই ভাষা দেননি; এদের অপ্রাপ্তি জনিত যন্ত্রণা, নিদারুণ কষ্ট, কৃচ্ছ্র সাধনা, হতাশা, অনাহার, ক্ষুধা, শোষণ, বঞ্চনা ও অপরিমেয় সমস্যা জর্জর জীবন যাত্রাকে জীবন্ত, বাস্তবসম্মত ও যথাযথভাবে তুলে ধরার সার্থক প্রয়াস করেছেন। স্রষ্টা হিসেবে সমকালীন সমাজকে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরার যে দায়িত্ব লেখকের থাকে, তিনি সেই দায়িত্ববোধকে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গেই

পালন করেছেন। তাঁর এই চেতনাবোধ তাঁকে সমসাময়িক লেখকদের মধ্য থেকে একেবারে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে এবং তাঁর সাহিত্যকর্মকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। এই স্বকীয়তার নিরিখে তাঁর রচিত খাদ্য সমস্যা সংক্রান্ত গল্পগুলি চিরভাস্বর ও নতুনত্বের আস্বাদে পূর্ণ।

নোবেল বিজেতা বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জন্মদিনে' (ইং ১৯৪১) কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতায় (ঐকতান) একদা বলেছিলেন,-

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।"[১]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তিত্বকে সাহিত্যের দরবারে দেখতে চেয়েছিলেন যাঁর লেখনি সমৃদ্ধ হবে সর্বহারা, নিগৃহীত, বঞ্চিত মানুষের ক্রন্দন ধ্বনিতে আর এই বঞ্চনাকে নির্ভর করে যিনি তাদের জীবন সংগ্রামের শরিক হয়ে তাদের মুক্তি-পথের দিশারি হতে পারবেন। বলা বাহুল্য, মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য কর্মে যেন এরই অনুরণন পরিদৃশ্যমান হয়। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব যেন মূর্তিময়ী হয়ে মহাশ্বেতার মধ্য দিয়ে বিদ্যারূপে, মাতৃরূপে ও শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি নিজের লেখার প্রেরণা ও উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন সময় নানা মন্তব্য করেছেন- যে সমস্ত মতামতগুলি থেকে তাঁর সাহিত্যের ধর্মটিকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। যেমন- একদা তিনি বলেছিলেন, "আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বারবার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The Voiceless Section of Indian Society. এই অংশ এখনও শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ো বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না। আমি পারি কি না জানি না, চেষ্টা করি মাত্র।"[২]- লেখিকার এই আত্মস্বীকৃতিই তাঁর সাহিত্য সৃজনের মূল উদ্দেশ্যটিকে পরিস্ফুট করে পাঠকের সকাশে। তাই দেখা যায়, লেখিকার অনেকগুলি ছোটগল্পে অন্তবর্গীয় মানুষের প্রান্ত ও ব্রাত্য জীবনের সমস্যাগুলি বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছে। সমাজের অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবহেলিত জনগণের জীবনভাষ্য রচনাতে যেন তিনি বদ্ধপরিকর এবং তাঁর লেখনি চিরকাল এ বিষয়ে সোচ্চার। সমস্যাদীর্ণ, অনাদৃত মানবজীবনের নগ্ন রূপচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যেমন একদিকে ঘুণে ধরা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অসারতা, ব্যাধি ও বিকারের চিত্রগুলিকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনই আদিবাসী (সাঁওতাল, শবর, লোধা সমাজ) জীবনের অভিশাপ ও তাদের জীবন অন্বেষণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার সুচিত্রকেও লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সাহিত্যের প্রধান পরিসরটিই বিস্তার লাভ করেছে সাবলটার্ন ও প্রান্তিক সমাজজীবনকে ঘিরে এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে; আর এই লেখনির যাদুস্পর্শে। জীবন যাদের চিরকালই বঞ্চিত করে এসেছে সেই সব মানুষের মর্মন্তুদ জীবন কাহিনি তাঁর সাহিত্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও নিপুণভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় মহাশ্বেতা দেবী দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও নিবিড় ও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন সমাজসেবী হিসেবে। এরপর থেকেই তাঁর কর্মী সত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। সমাজকর্মী হিসেবে উপলব্ধ জীবনাভিজ্ঞতার নির্মম রূপচিত্রণে তিনি তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত, সর্বহারা ও নিরন্ন শ্রেণির উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের পাশে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে তাদের কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের যে বিষয়টিকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা হল ক্ষুধা বা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি। খিদের জ্বালায় জর্জরিত এই মানুষগুলির জীবনে খাদ্য সমস্যা যে কতটা ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তারই দলিল পাই মহাশ্বেতার জীবনাভিজ্ঞতা প্রসূত লেখনিমুখে। ভাত,

জল, নুন, ঘর- এগুলি হল মানুষের মৌলিক চাহিদা। এই ন্যূনতম মৌল চাহিদাগুলি ভারতবর্ষের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষের পূরণ হয়নি স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও। নির্যাতিতেরা, বঞ্চিতেরা সমাজের কাছে করুণা ভিক্ষা করে; প্রসাশনের কাছে-রাষ্ট্রের কাছে প্রতিকার চায়, কিন্তু কোনো সুরাহা মেলে না- বিফল মনোরথ হয়ে অবশেষে প্রতিকারের পথ নিজেরাই বেছে নেয়। ব্যর্থ, অসহায়, নির্যাতিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত মানুষগুলির সংগ্রামশীলতার কথা মহাশ্বেতা তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় স্থান দেন। তিনি তাই সগর্বে বলতে পারেন তাঁর লেখনির মূল প্রেরণাই হল নিম্নবর্গীয় সমাজের ডোম, বাগদি, পাখমারা, ওঁররাও, গঞ্জু, বাউরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। তারা প্রতিনিয়ত সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ ও শাসক শ্রেণির দ্বারা শোষিত ও প্রতারিত হয়েছে। তাই করুণাময়ী দৃষ্টিতে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারি, কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।"[৩] বলা উচিত, স্বভাবতই মহাশ্বেতার ব্যক্তিজীবন জড়িয়ে গিয়েছিল সাধারণ আদিবাসী মানুষের সঙ্গে এবং অনিবার্যভাবেই এর ছাপ পড়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। বিজন ভট্টাচার্যের বিবাহ বিচ্ছেদের পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসী জনগণের সুখ দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন ও তাদের উন্নতিকল্পে সর্বান্তকরণে নিজেকে সঁপে দেন। এই সুবাদে তিনি বহু আদিবাসী অঞ্চল ভ্রমণও করেন। পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর ও রাঁচি পালামৌ অঞ্চলের মুণ্ডা- ওঁররাও সম্প্রদায়ের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ছাড়াও উড়িষ্যার অসহায়, সমস্যা জর্জর, দ্বন্দ্ব ক্লিষ্ট আদিবাসী মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ঘটে। তাছাড়া গুজরাট, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের নিম্নবর্গীয় মানুষদেরও তিনি জানেন ও তাদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন। বহুদিন ধরে তিনি অরণ্য অঞ্চল ও অরণ্য সংলগ্ন আদিবাসী তপশিলি শ্রেণিভুক্ত মানুষের সংস্রবে থেকেছেন। তাদের বহু সংগঠনের সঙ্গে তিনি নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন। তবে তাঁর আদিবাসী দরদী চিত্তের পরিচয় আমরা আরও বহু আগে থেকেই লক্ষ করি। তাঁর জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহাশ্বেতার পিতা মনীশ ঘটক চাকরিসূত্রে মেদিনীপুর অঞ্চলে থাকাকালীন তিনি সাইকেলে চড়ে আদিবাসী পরিবৃত অঞ্চলে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মহাশ্বেতা যদিও অনেকটা রোমান্সপ্রধান রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই নিম্নবিত্ত আদিবাসী সমাজ তথা নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষদের দুঃখ দৈন্য, দুর্দশা, সমস্যা ও সার্বিক শোচনীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিজের রচনার গতিপথ পরিবর্তন করে। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭)-উপন্যাসটি এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে। আমাদের সমাজ উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের দ্বারা আচ্ছন্ন যেখানে উচ্চবিত্তের প্রভাবে নিম্নবিত্ত সর্বত্রই নিগ্রহের শিকার -যার ছবি ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। মহাশ্বেতা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দেখেছেন দারিদ্র্য নিরন্ন মানুষের অসহায়তা, ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শোষণযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। তাঁর চোখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে, এক শ্রেণির মানুষ সবধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষণ ও বঞ্চিত করে চলেছে নিম্নবিত্ত খেঁটেখাওয়া মানুষদের,অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের ওপর;আর অন্যদিকে হত দরিদ্র মানুষের প্রতিদিন বেঁচে থাকার ন্যূনতম মৌল উপকরণ সংগ্রহ করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে অথচ তবু তারা বঞ্চিতই হয়ে চলেছে ক্রমাগত। -সমাজের এই বৈষম্যে গর্জে উঠেছে মহাশ্বেতার প্রতিবাদী সত্তা, তাঁর সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবাদের এক ভিন্ন রূপ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার আদিবাসীদের অর্থসংকট দূরীকরণের জন্য তিনি যেমন তৎপর হয়েছিলেন, উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হয়েছিলেন; তেমনই সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের বঞ্চিত,হৃতসর্বস্ব জীবনের কথা তুলে ধরে তাদের সমস্যার স্বরূপটিকে শিক্ষিত মহলে প্রকাশ্যে গোচর করার অভিলাষ নিয়ে প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী বিশ্বাস করতেন দরিদ্র জনগণকে কিংবা ভারতের প্রান্তসীমার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা না জানল,তাদের না বুঝলে ভারতবর্ষকে পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয় কোনো দিনই। এদিক থেকে তিনি ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যেহেতু এই জনবৃত্তের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়;তাই অতিসাধারণ-ব্রাত্য-অন্ত্যজ-অপাংক্তেয়-শোষিত-দরিদ্র-সর্বহারা মানুষের

উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টাকরে ও সাহিত্যে তাদের যোগ্য স্থান দিয়ে ,তাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে তিনি সচেষ্ট হয়ে তাদের কথা তুলে ধরার মধ্যদিয়ে "তিনি হয়ে উঠেছেন একজন 'Activist Writer'।"[৪]

মহাশ্বেতা দেবীর বহু গল্পেই অনায়াস দক্ষতায় ফুটে উঠেছে নিম্নজীবী মানুষদের মৌল চাহিদা নির্ভর সমস্যার কথা। বিশেষত খাদ্য সমস্যা তথা ভাত সমস্যাটি যে গল্পগুলিতে প্রধানভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল- 'ভাত', 'বান', 'জাতুধান', 'সাঁঝ সকালের মা', 'রুদালী', 'রাক্ষস', 'জল', 'নুন', 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ', 'ব্রাহ্মণ', 'জন্মতিথি' প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু গল্প।

মহাশ্বেতা দেবীর ভাত সমস্যা কেন্দ্রিক একটি উৎকৃষ্টতম গল্প হল 'বান'। গল্পটি ইং ১৯৬৮ সালে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি একটি চরিত্র মুখ্য (Stories of Character) গল্প। আলোচ্য গল্পে যাকে আশ্রয় করে কাহিনির বিস্তার ও পরিণতি তার নাম চিনিবাস। পিতৃহীন, সহায়-সম্বলহীন, রোজগারহীন পরিবারের অসহায় বালক এই চিনিবাস। যারা দুবেলা দুমুঠো গরম ভাত খেতে পায় না; পানা পুকুরের কুড়িয়ে আনা কচু, ঘেঁচু ও গুগলির শাঁস সেদ্ধ করেই যাদের সংসার চলে, তেমন একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে এই চিনিবাস। তাই গল্প মধ্যে শ্রেণিহীন, বিত্তহীন, সহায়-সম্বলহীন চিনিবাসের গরম ভাত খাওয়ার স্পৃহা ,লালসা ও চাহিদাকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। পরের বাড়ির গরম ভাত খাওয়ার আশায় সে হাপিত্যেশ করে থাকে- ক্ষুধা নিবৃত্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে নিজের অভিমত পোষণ করে। ক্ষুণ্ণি বৃত্তির তাগিদ মানুষের প্রবৃত্তিকে কীভাবে চালিত করে; ধর্ম সংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা সবকিছুই যে পেটের জ্বালার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়- তারই মমন্তুদ এক চিত্র পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। বলা বাহুল্য, খাদ্য সমস্যার ভিন্নতর রূপ তথা ভাত সমস্যার প্রতিফলনকে চিনিবাসের মনোভাবের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই গল্পের মূল বিষয়। গল্পের আলোচনায় দেখা যায়, ভাদ্রমাসের রান্নাপুজোর দিনে চিনিবাস তার মা রূপসী বাগদিনীকে রান্নাপুজোর কথা বলে- অন্তরে এই আশা নিয়ে, অন্তত এই একটি দিনে পুজোর নাম করে হলেও ভাত খাওয়াটা ভালোভাবে হবে। কিন্তু রূপসী জানায় যে, কাটোয়ার জ্যেঠা মারা যাওয়াতে এবছর রান্নাপুজো হবে না। অবশ্য পুজোর যোগাড় কীভাবে হবে সে নিয়ে চিনিবাসের কোনো মাথাব্যাথা নেই। কারণ, সে জানে প্রত্যহ ভাতের যোগান ধরতে না পারলেও পুজোর দিনটিতে ঠিকই কোনো না কোনো উপায়ে সব আয়োজন হয়ে যায়, বরাবর তা-ই করে এসেছে রূপসী। তাই চিনিবাসের উদরপূর্তিটা সেদিন তৃপ্তি করেই সাঙ্গ হয়। কিন্তু এবারে তাদের গ্যাতির মৃত্যুতে বাড়িতে রান্নাপুজোতে বাধা পড়ায় মনক্ষুণ্ণ হয় চিনিবাসের। তবু সে হাল ছাড়ে না, গ্রামের বড়ো বাড়িতে তথা আচার্য বাড়িতে তো হবেই- এই ভেবে মন খারাপ নিয়েও সে সেখানে ছুটে যায় পুজোর শেষে পেট ভরে ভাত খাওয়ার আশায়। তাই সে আচার্য বাড়িতে গিয়ে আচার্য গৃহিণীর রান্নাপুজোর জন্য মনসা গাছের যোগান দিতে চায়। আচার্যদের সচ্ছল অবস্থা, এখনও ওই বাড়িতে শতশত লোককে দু-বেলা পাত পেড়ে খেতে দেওয়া হয়। চিনিবাস বড়ো আচার্য গৃহিণীর কাছে গিয়ে মনসা গাছ আনার কথা জানালে আচার্যানী রূপসী বাগদিনীর ছেলে (বেটা) চিনিবাসকে দেখে রেগে যান- তাঁর সর্ব অঙ্গ জ্বলে যায়। মনে মনে তাকে 'অপয়া' বলে গালিগালাজ করেন। কিন্তু এই গালিগালাজে কর্ণপাত করে না সে, বরং ক্ষুধার্ত চিনিবাস উঠোন থেকে দাঁড়িয়ে গরম ভাতের গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে যা লেখিকার ভাষায় রূপ পায় এভাবে,- "রান্নাঘরের দোর দিয়ে গরম ভাতের গন্ধ আসছে। ...কতদিন চিনিবাস গরমভাত খায়নি। কতদিন বামুন বাড়িতেও খায়নি।"[৫]- তাই সুতীব্র আশা নিয়ে অনড় অচল ভাবে দাঁড়িয়েই থাকে সে। কিন্তু তার এই অপ্রত্যাশিত আগমন বড়ো আচার্য গৃহিণীর যেমন কাঙ্ক্ষিত নয়, তেমনই ছোট আচার্যানীও তাকে সহ্য করতে পারেন না। বড়ো গৃহিণীর ক্ষোভের কারণ হল চিনিবাসের মায়ের রূপ আর পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা- যদিও রূপসী বাগদিনীর মতো গরিব মানুষ এই 'পূর্বস্থলী'তে কেউ নেই। আর ছোট আচার্যানীর মনে ভয়, ক্ষুধার্ত চিনিবাসের কু-নজর লেগে বুঝি তাঁর কোলের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই শিশু সন্তানের ওপর থেকে চিনিবাসের কু-দৃষ্টি এড়ানোর জন্য চিনিবাসকে মুড়ি দিয়ে বিদায় করেন। তবু মিটল না তার ক্ষুধার তাড়না, "চিনিবাসের চোখ দুটো যেন সর্বদা খাই খাই। এত খিদে ওর কোত্থেকে আসে কে জানে।"[৬] এই দুর্নিবার ক্ষুধা চিনিবাসের একার নয়- একটি পিতৃহীন, নিরন্ন পরিবারের অভাগা

সন্তানের প্রতিনিধি হয়ে সে যেন চোখে মুখে প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে তার অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষুধার এক নিদারুণ মর্মজ্বালাকে।

এদিকে মুড়ি নিয়ে ছুটে চলে আসে চিনিবাস খাল ধারে তার দিদিমার কাছে। তাদের পরিবার বলতে ওই তিনজনই সদস্য- সে, তার মা রূপসী ও দিদা (রূপসীর মা)। তার দিদা তখন জলে ভরা খালে গেঁড়ি-গুগলি (শামুক) খোঁজায় ব্যস্ত, তা-ই সেদ্ধ করে খেতে হবে তো। চিনিবাসও দিদিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুগলি তুলল, যতক্ষণ না হাত পা জলে ভিজে অসাড় হয়, তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে দিদার কাছে বানের (বন্যার) গল্প শুনতে চায়- যে বানের জলে, যে প্লাবনের জোয়ারে মানুষ-গোরু-শেয়াল-কুকুর সব ভেসে গিয়েছিল। এই বানের প্রকোপের কথা গল্পের আদলে শুনতে থাকে সে- সেই গল্প দিদার কাছ থেকে শুনতে শুনতে একটা জায়গা খুব ভালো লাগে তার। তা হল, বানের সময়ে মানুষেরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে সকলে মিলিত হতে বাধ্য হয়েছিল। বামুনেরা ধামা ধামা চিড়ে-মুড়ি-বাতাসা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। যাদের রান্নার জায়গা ছিল তাদের চাল-ডালও দিয়েছিলেন তাঁরা। আচার্য বাড়িতে সুন্দরী যুবতী রূপসী বাগদী ও তার মা-ও আশ্রয় পেয়েছিল, তাদের রাঙাবস্ত্র ও খাবারের যোগান ধরেছিলেন বড়ো আচার্য মহাশয়, এমনকি তাদের থাকার জন্য নতুন গোয়ালঘরে জায়গা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া মাঁচা থেকে শুকনোকাঠ-চাল-ডাল-তেল-নুন-সিধে-আনাজপাতি-মাছ দিয়েও তাদের সাহায্য করেছিলেন। বন্যার জল সরে গেলেও চিনিবাসের মা ও দিদিমা অনেকদিন আচার্যবাড়িতে থেকে যায়। - এই অংশগুলি বারবার শুনতে চিনিবাস খুব পছন্দ করে।

অবশেষে নিজের মাহিন্দারের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দিলেন বড়ো আচার্যীকর্তা। চিনিবাসের জন্ম হল, কিন্তু জ্বরে ভুগে মারা গেল তার পিতা। সেই থেকে চিনিবাসের মা-দিদিমা তাকে দু-বেলা পেটপুড়ে দু-মুঠো খেতে দিতে অসমর্থ হয়। তাই খাবারের আশায় সর্বদা বুক বেঁধে এবং স্বপ্নময় বানের অলীক কল্পনা নিয়ে বসে থাকে চিনিবাস।

ইতিমধ্যে দিদিমার কাছে গল্প শোনার মাঝখানেই শোনা গেল ঢাকের বোল-0 গ্রামে গ্রামে ঢোলমোহর দিয়ে আচার্য বাড়িতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগমনবার্তা তথা গোরাবানের কথা ঘোষণা করে। সেই বান উপলক্ষে আচার্য বাড়িতে কীর্তন, ঠাকুরসেবা, প্রসাদ বিতরণ আর গৌরাঙ্গ দর্শনের জন্য গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। চিনিবাস ছুটে গিয়ে এই গোরাবানের খবর মা রূপসীকে জানায় এই আশায় যে, এই বানও গঙ্গার জলপ্লাবিত বানের মতোই হবে, যেখানে সবাই যাবে, যেখানে দিবাকর চক্রবর্তীর মতো বামুন, চিনিবাসের মতো বাগদী সবাই একসঙ্গে বসে খেতে পাবে। বুকভরা আশা নিয়ে চিনিবাস তার মা (আয়ী)-কে জানায়,-"চিড়ে মুড়ি না রে আয়ী! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল, আর নারকেল ছাঁচিকুমড়োর বেন্নুন।"[৭]- এই অন্নময় স্বপ্নে বিভোর হয়ে চিনিবাস ডুবে থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গৌরাঙ্গ না আসায় বিকেলে মাহিন্দাররা ভক্তদের মুড়ি বাতাসা দিয়ে বিদায় দেন। লেখিকা এপ্রসঙ্গে গল্প মধ্যে বলেছেন, "শুধু তো গৌরাঙ্গ দর্শন নয়, পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা।"[৮]- অর্থাৎ পেটভরে খেতে পাবে বলেই মা-ছেলে, বুড়ো-বুড়ি, কানা-খোঁড়া, অনাথ-আতুর সবাই এসে বসেছিল। তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল চিনিবাস- গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না- চিনিবাসের স্বপ্নভঙ্গ হল, আশাহত হয়ে তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। ক্ষুধার্ত দর্শনার্থীদের অভিপ্রায় ছিল খেতে পাবে- কিন্তু তা না হওয়ায় তারা বলল, "তা .... মুড়ি বাতাসা দিচ্ছে কেন গো? পেসাদ পাব বলেছিলে না? ...কিন্তুক আমরা খাব বলে আশা করে এসিছি গো।"[৯] অতীতে গঙ্গার কোনো এক বান তার ভয়ঙ্কর প্রতাপে অন্তত সাময়িক ভাবে হলেও জাত-পাতের বিভাজন দূরীভূত করে দিয়ে নিরন্ন, অনাহার ক্লিষ্ট, পদপিষ্ঠ, অন্ত্যজ, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষগুলিকে দুটো অন্নের সংস্থান করে দিয়েছিল। উঁচু জাতের ক্ষমতাবান প্রতিভূরা বন্যার ধাক্কায় বাধ্য হয়ে ছিল প্রান্তবর্গীয় হতভাগ্য, বিত্তহীন মানুষগুলিকে খাদ্য পরিবেশন করতে। তাই এবারও তাদের আশা ছিল অনুরূপ। লেখিকার ভাষায় সত্যি যেন তাদের কাছে "ঠাকুরদর্শনের চেয়ে খাওয়াটাই বড়ো।"[১০] এই ভাত খাওয়ার আশা নিয়ে তো চিনিবাসও বসে ছিল, কিন্তু তার স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় সে তার মা রূপসীকে রান্নাপুজো না করার জন্য ক্ষুব্ধ চিত্তে, অভিমান ও অভিযোগের সুরে, রাগ

করে জানায়- "কেন আমার পেট ভরে ভাত খেতে সাধ যায় না?"[১১]- এই অংশে লেখিকা ক্ষুধার্ত চির আকাঙ্ক্ষিত চিনিবাসের অসহায়তাকে জীবন্ত ভাষায় মূর্ত করে তুলেছেন।

বন্যা বা বানের প্রকোপ স্বাভাবিক ভাবে ও সাধারণত ভয়াবহই হয়- তা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ মাত্রই তটস্থ থাকে। বানের কবলগ্রস্ত, দুর্দশাভোগী মানুষ কোনোদিনই প্রত্যাশা করে না যে বন্যা আসুক বা একটি স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে তচনচ করে দিক, একটি সুন্দর জীবনকে ব্যাহত করে উদ্বাস্তু ও ছিন্নমূল করে দিক মানুষকে। তাই বানের আগমন আমাদের কাছে প্রত্যাশার হতে পারে না কোনোদিনই অথচ বন্যা ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও চিনিবাসের মতো মানুষের কাছে তা ভাত সমস্যা থেকেও অনেক বেশি ফলপ্রসূ ও শান্তিদায়ক। কারণ, তাদের সমাজে একদিন এই বানই বহন করে এনেছিল ক্ষুধা নিবৃত্তির যথেষ্ট উপকরণ। উদরপূর্তির এরথেকে ভালো সুযোগ তাদের জীবনে আর আসেনি ইতিপূর্বে। গৌরাঙ্গের নামে সমাজে সেদিন যে বান এসেছিল তা চিনিবাসের খিদে মেটাতে পারেনি। তাই বানরূপ চৈতন্য রেনেসাঁসের মাহাত্ম্য ওই শ্রেণির অভুক্ত মানুষের বোঝার কথাও না বা তাদের কাছে তা ততো বেশি আবেদন নিয়ে আসেও না- যতোটা আনতে পেরেছিল সর্বনাশী বন্যার ভয়াবহতা। তাই চিনিবাস মনে মনে জলপ্লাবিত সত্যিকারের বানকেই আজও আকাঙ্ক্ষা করে, সেই কামনাতেই সে গল্পের পরিণতিতে বলতে পারে, "গৌরাঙ্গের বানের চে সে বান ভাল রে আয়ী।তেমন বান আর আসে না ?সেই যে ,যেমন বানে চিড়ে মুড়ি চাল দেয় এত? দুস্কু ঘুচে যায় ?"[১২] একটি পরিবারে খাদ্য সমস্যা কতটা প্রকট হলে, নিরন্ন থাকার যন্ত্রণা কতটা বেদনাদায়ক হলে,খাদ্যের অভাব কতটা ভয়াবহতার রূপ পেলে, ভাত খেতে না পারার মর্মজ্বালা কতটা দুর্বিষহ হলে, ক্ষুধার্তের আকুতি কতটা মর্মান্তিক হলে মানুষ এহেন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে পারে তা ভাবলেই শিহরণ জাগে মনে। ভয়ানক বন্যাও ভাত সমস্যার তীব্রতার কাছে তুচ্ছ- নিষ্প্রভ হয়ে যায় বলে প্লাবনও তাদের কাছে তখন প্রার্থিত বলেই মনে হয়।

এই গল্পে অবশ্যই "চিনিবাসের মতো প্রান্তিক বাগদি মানুষের সামাজিক অবস্থানটিও আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।"[১৩] এই সামাজিক পরিকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই চিনিবাস খাদ্যের জন্য সারাদিন অপেক্ষারত থেকেও ভাত পায় না। সমালোচকের ভাষায় তাই বান হয়ে ওঠে "খিদের সঙ্গে লড়াইয়ের এক শিউরে ওঠা শিল্পরূপের বহিঃপ্রকাশ।"[১৪]- ফলে ক্ষুধা কাতর চিনিবাসের মানসিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে এই গল্পের বয়ন শিল্পের মধ্যে। 'বান' শব্দটি যে ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে খাদ্য সমস্যাকেও অভিব্যক্ত করতে পারে- সেই কৌশল জানা ছিল মহাশ্বেতা দেবীর। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার ভয়াবহতা ও বীভৎসতা, তার অসহায় ও কুৎসিত রূপের অন্তরালেও যে খাদ্য সমস্যা জর্জর মানুষগুলি প্রাণ পেতে পারে; জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে এই বন্যাকেও যে অঙ্গীকার করে নিতে আগ্রহী এক শ্রেণির নিরন্ন মানুষ- সেই শুভ সূচক অর্থবহ ইঙ্গিতটিও যেন বহন করে চলেছে মহাশ্বেতার ব্যবহৃত 'বান' শব্দটি। যে আর্তনাদ বন্যা ত্রাসিত মানুষের মধ্যে আশা করা যায় তার থেকে অনেক বেশি কারুণ্যের সুর বেজে উঠেছে খাদ্য সমস্যাভোগী মানুষের মর্ম যন্ত্রণার মধ্যে। তাই 'বান' শব্দটি তার ভয়াবহতা কাটিয়ে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে একটি বিশেষ শ্রেণির কাছে কীভাবে স্বমহিমায় তার আবিলতা পরিত্যাগ করে খাদ্য পূরণের অঙ্গীকার হয়ে ওঠে- মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য গল্পে সে কথাই নতুন দ্যোতনায় প্রকাশ করেছেন। জীবনকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চয় করেছিলেন বলেই তিনি মানুষের প্রাথমিক সমস্যার নবরূপায়ণ ঘটালেন নতুন ভাবনায়, অনবদ্য ভঙ্গিতে- আর আমাদেরও তাঁর ভাবনার সমভাগী হওয়ার সুযোগ করে দিলেন এই 'বান' গল্পটির মাধ্যমে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পটিও একটি অসাধারণ শিল্প সৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। গল্পটি ইং ১৯৮২ সালে 'ম্যানিফেস্টো'-তে প্রকাশিত হয়। সমালোচকের ভাষায় বলা চলে,- "গল্পটিতে রয়েছে চিরক্ষুধার্ত মানুষের কথা"।[১৫] যথার্থ অর্থেই বলা যায়, এখানেও রয়েছে অন্ন সমস্যার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। গল্পের প্রধান চরিত্র উৎসব নাইয়া (উচ্ছব) গ্রাম থেকে এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কে হারিয়ে অনাহার ক্লিষ্ট যন্ত্রণায়

পাগলের মতো হয়ে সংবিৎ হারিয়ে কোলকাতার পথে এসেছে কাজের সন্ধানে, শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। উচ্ছবের মতো আরও অনেকেই শুধু পেটের দায়ে, ভাতের আশায়, খাবারের অভিলাষ নিয়ে শহরের দিকে পাড়ি জমায়, পেট চুক্তিতে কাজ করে।

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্রী প্রতীম পিসিমার পরামর্শ ক্রমে বাড়ির দাসী বা পরিচারিকা যার নাম বাসিনী, তার সহায়তায় সেই মনিব বাড়িতেই কাঠুরিয়া হিসাবে কাঠ কাটার কাজ পায় উচ্ছব। অনাহার ক্লিষ্ট উচ্ছব শুধুমাত্র ভাত খেতে পাবে বলে "এই চোদ্দ দফায় কাজ" করতে সম্মত হয়। [১৬] সে কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে পরিবার বিরহের অমানসিক যন্ত্রণাকে বুকের ভেতর চেপেরেখে হলেও শুধু ভাত খেতে চায়। কারণ, মনিব বাড়ির বড়ো ছেলের বউ কে বলতে শুনি, "ও নাকি ক'দিন খায় নি"। [১৭] তাছাড়া সে নিজেও বাসিনীর কাছে চাল চেয়েছিল-বলেছিল, "একমুষ্টি চাইল দে। গালে দে জল খাই। ...সেই কদ্দিন ঘরে আদা ভাত খাই না"।[১৮] দীর্ঘ দিন যাবত ভাত খেতে না পাওয়ার স্পৃহা ও লালসা তাকে স্বাভাবিক মানুষের স্তর থেকে অর্ধোন্মাদ একটি পাগলের স্তরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই এই ক্ষুধা নিঃসরণের তাগিদে আজ সে সব রকম শারীরিক ও পাশবিক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতেও রাজি।

বিরাশি বৎসরের গৃহকর্তার মৃত্যুকে রোধ করার জন্য তান্ত্রিকের নির্দেশক্রমে হোম-যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। বেল, ক্যাওড়া, অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল গাছের কাঠ এসেছে আধ মণ করে। সেগুলো সব এক মাপে কাটতে হবে, তাই উচ্ছবকে ধরে এনেছে বাসিনী কাঠ কাটার কাজ দিয়ে। সে কাঠ কাটবে অথচ কয়েক দিন অনাহারে রয়েছে- একথা তথাকথিত সম্ভ্রান্ত মনিব পরিবারের মানুষেরা অনেকেই ভাবতে পারে না। তাই বড়ো বউ বলেছে, "এ আবার কি কথা? বাদায় চালের অভাব নাকি? দেখ না এক তলায় গিয়ে। ডোলে ডোলে কত রকম চাল থরে থরে সাজানো আছে"। [১৯] -বিত্তহীন খেঁটে খাওয়া মানুষ যে দিনের পর দিন অনাহারে কাটায়, তাদের ঘরে যে অন্ন সংস্থান থাকে না-একথা ওপর তলার মানুষের কাছে অকল্পনীয়। কারণ, তাদের জমিতে (বাদায়) ও ভাঁড়ার ঘরে তো সর্বক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে চাল মজুত থাকে, রক্ষিত থাকে নানা ধরণের খাদ্য সামগ্রী। অথচ এরই পাশাপাশি লেখিকা অনবদ্য ভঙ্গিতে আমাদের জানান যে, কয়েকদিন না খেয়ে থেকেও কাঠ কাটতে চলে আসে নির্বিকারে, দ্বিধাহীন চিত্তে শুধুমাত্র খাবারের আশায়। এই ইঙ্গিতটিকে লেখিকা অতুলনীয় ভাষায়, অসামান্য ভঙ্গিতে, সজীব ও প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুললেন উচ্ছব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া উচ্ছব বাসিনীর মুখে শুনতে পায়, এই বাড়ির বাবুরা নানাজন, বিভিন্ন প্রকার চালের ভাত খান-কেউ খান ঝিঙেশাল চালের ভাত- নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে, কারও জন্য রান্না হয় রামশাল চালের ভাত- মাছের সঙ্গে খাবার জন্য, বড়োবাবু কনকপানি চাল ছাড়া খানই না, মেঝ আর ছোটর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রাঁধা হয় এবং বামুন-চাকর-ঝি'দের জন্য বানানো হয় মোটা সাপটা চালের ভাত। মনিবের বাদায় এত চাল যে না খেতে পেয়ে তারা তা বিক্রি করে দেয়। বাসিনীর মুখে দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকা উচ্ছব রকমারি চালের নাম শুনে চমকে যায়। নানাবিধ চালও যে হয়ে থাকে তা ছিল তার কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার। তাই চালের নাম শুনতেই তার লালসার তীব্রতা যেন চূড়ান্ত মাত্রা পায়-তবু নিজেকে সংবরণ করে সে-তবু চোখ তার যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় আর খালি পেটে যেন আঁচড় কাটতে থাকে।

পেটের তাড়না, ক্ষুধার জ্বালা যে কি দুর্বিষহ ভয়াবহ ও মর্মান্তিক পরিণতি এনে দিতে পারে তার স্বরূপ ফুটে উঠেছে গল্পটিতে। তাই তো দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে উচ্ছবের অনাহার ক্লিষ্ট বউ-ছেলের মৃত্যু হলেও তাদের জন্য শোক প্রকাশ করেনি বা দুঃখ প্রকাশ করার অবকাশটুকু পায়নি সে। তাদের নিয়ে চিন্তা করার ফুরসতটুকুও হয়নি তার। এর আগেই ক্ষুধার জ্বালা তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগলে পরিণত করে দিয়ে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে, "ভাত খাবে সে ভাত। ...বউ ছেলে মেয়ে অপঘাতে মরল, মানুষ পাগল হয়ে যায়। উচ্ছব ভাত ভাত করচে দেখ।"[২০] তার আচরণ অনেকের কাছে শুধু অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়নি, বরং তারা তাকে একথা বলে শুষ্ক জ্ঞান দান করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে-যাতে সে পরিবারের শ্রাদ্ধ করে। এদিকে কাঠ কাটতে কাটতে

খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে সে বড়ো পিসিমাকে বলে, "বড় খিদে নেগেচে মা গো।"(২১) কিন্তু তখনও হোমযজ্ঞ সাঙ্গ না হওয়ায় কেউ খেতে পারবে না-এই বিধান দিয়েছেন তান্ত্রিক বাবা। তাই তার আর খাওয়া হয় না। কিন্তু "ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাকে বড়ো উতলা করে।"(২২) গন্ধেই যে প্রেম এসে যায় তার মনে-সে আর টিকতে পারে না, অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অবশেষে বাসিনী এসে তাকে ছাতু দিয়ে যায়-তা খেয়ে সে আবার কাজে লেগে যায়। কিন্তু ভাতের খিদে তার নিবারণ হয় না। পরিবার, পরিজন ও আত্মজদের কথা, তাদের বিচ্ছেদ ভাবনা তার মাথাতেই নেই ; এমনই বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে সে, যা লেখিকার বর্ণনায় ভাষা পায় এভাবে,- "পেটে ভাত নেই বলে উচ্ছবও প্রেত হয়ে আছে। ভাত খেলে সে মানুষ হবে। তখন বউ ছেলে মেয়ের জন্য কাঁদবে। দুঃখ তো ওর হয়নি। ও শুধু পাগল হয়ে বউ মেয়েকে ডেকেছিল কয়েক দিন ধরে। তখনই উচ্ছব প্রেত হয়ে গেছে। ...উচ্ছব কাঠ কাটা শেষ করে। আড়াই মণ কাঠ কাটল সে ভাতের হুতাশে। নইলে দেহে ক্ষমতা ছিল না।"(২৩) ভাতের জন্য কী অপরিসীম স্পৃহা, কতটা অনিবারণীয় আকাঙ্ক্ষা, কতখানি অতৃপ্তির উপলব্ধি দেহে-মনে-মস্তিষ্কে কাজ করলে তবে একজন মানুষের পক্ষে অভুক্ত থেকে বিরামহীন ভাবে এহেন কাজ করতে পারে-তা ভাবলেই আমাদের মনে শিহরণ জাগে।

'ভাত' গল্পের শেষাংশে ঘটনা আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে-ক্ষুধার্ত উৎসব পেটের খিদে সহ্য করতে না পেরে যখন আরও হিংস্র হয়ে ওঠে এবং তার ক্ষুধা তুঙ্গে উঠতে থাকে। পুজো শেষ হওয়ার ঠিক পরেই রোগশয্যায় শায়িত বিরাশি বছরের মুমূর্ষু গৃহকর্তা মারা যান। ফলে নতুন শাস্ত্রীয় বিধান জারি করা হয়, সেই মর্মে অশৌচের বাড়িতে যজ্ঞ উপলক্ষে যে সব রান্না করা হয়েছিল সেগুলি ফেলে দিতে হবে। বড়ো পিসিমার নির্দেশে বাসিনী সর্বস্ব রান্না ঢেলে দিতে যায়। স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন উৎসব যখন বুঝে যায়, ফেলে দেওয়া হবে সমস্ত ভাত-তরকারি, তখন তার অন্তরাত্মা আহত ফণীনির মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। তার মাথার ঠিক থাকে না, কোনো নিয়ম রীতির তোয়াক্কা না করে, বিধি নিষেধের বাধা না মেনে সে বাসিনীর হাত থেকে মোটা চালের পিতলের বিশাল অন্নপাত্রটি (ডেকচি) নিয়ে ছুটে চলে যায় সকলের নাগালের বাইরে-স্টেশনের দিকে। স্টেশনে এসে সে কবজি ডুবিয়ে আকণ্ঠ ভাত খায় এবং নিরন্ন পেটে ভাতের ভার নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে,-"বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গসুখ পায় ভাতের স্পর্শে।"(২৪) যদিও সে মনিবদের রহস্যময় অন্নসত্র তথা অদেখা চালের বাদাটির সন্ধান করতে চেয়েছিল-কিন্তু তার খোঁজ করা হয়ে ওঠে না আর উচ্ছবের। তার আগেই মনিব বাড়ির পেতলের ভাতের হাঁড়ি চুরি করার অপরাধে তাকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সমালোচকের ভাষায়, "কোনও পক্ষই অপরপক্ষকে ঠিক মতো বুঝতে পারে না।"(২৫) সত্যিই তা-ই, উৎসবের খিদের জ্বালা পরিমাপ করার মাপকাঠি বোধহয় কারোরই জানা নেই, তাই তার এহেন কার্যকলাপের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকা কার্যকারণ সম্পর্কের বিচার না করে, হাঁড়ি চুরির দায়ে তাকে পুলিশে দেওয়া হল। সত্যিই কী সে হাঁড়িটি চুরি করার জন্য এনেছিল, নাকি খেতে না পাওয়া একটি মানুষের চোখের সামনে এতো খাবারের অপচয় ঘটার হাত থেকে খাবারগুলোকে বাঁচানোর জন্য ও নিজের উদরপূর্তির জন্যই সে ডেচকিটি আনতে বাধ্য হয়েছিল-এই যুক্তি অনুধাবন করার শক্তি ও সামর্থ্য সেদিন সমাজের কারোর ছিল না। সাধারণত আমরা অশৌচের বাড়ির ভাত খেতে যেখানে নারাজ হই, সেখানে সেই বিধি-নিষেধকে তুচ্ছ করে দিয়ে উৎসব পেটের জ্বালার কী বীভৎস তাগিদে এজাতীয় খাদ্য খেতে পেরেছে ও পরমানন্দিত হয়েছে-তা ভাববার বিষয়। খাদ্য গ্রহণের স্পৃহা ও তৃপ্তির কাছে বাকি নিয়মকানুন ও সংস্কার যে 'এহোবাহ্য' হয়ে যায় উৎসবের কাছে, লেখিকা তেমন একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, আমাদের ভাবার অবকাশ দেননি। তার আগেই উৎসবের জীবনে ও গল্পমধ্যে নেমে এসেছে চরম ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি নিয়তি নির্দেশিত। চুরি না করেও চুরির দায়ে ভার বহন, মিথ্যা অভিযোগ ও জেল খাটার মতো দুর্বহ যন্ত্রণা উৎসবকে নীরবে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে শুধুমাত্র খাদ্য সঙ্কটে পড়ে। কী নিদারুণ মর্মযন্ত্রণার ফসল এই 'ভাত' গল্প-তা গল্পের পরিণতির দিকে দৃকপাত করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অসহায় মানুষ কীভাবে দিনের পর দিন খিদের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে অথচ সমাজের কোপ এসে পড়েছে তাদেরই হতভাগ্য ললাটে-তারই মর্মন্তুদ চিত্ররূপ পাই এই 'ভাত' গল্পে।

মহাশ্বেতা দেবীর এজাতীয় অন্যান্য বহু গল্পেও দেখি যে, খাদ্য সমস্যা তথা ভাত সমস্যা চূড়ান্ত ভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে ; অভাগা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যার বীজ প্রোথিত ছিল। তবুও তাদের খাদ্য অন্বেষণের স্পৃহা মেটেনি। খাদ্য সমস্যা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, খাদ্যের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে,কত ঝড় ঝাঁপটা অতিক্রম করেও নিরন্ন মানুষ তার মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান খাদ্যকেই যে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, তাদের অনুভব যে স্তরে স্তরে পৃথক মাত্রা পায়-তা মহাশ্বেতা বিভিন্ন গল্পে, বিচিত্র বর্ণে নানা ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ভাত সমস্যা বা খাদ্য সমস্যা। মানুষের মৌল চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য যেমন প্রধান, তেমনই দেশের নাগরিকদের দুবেলা দুমুঠো খেয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটিও চিরসত্য বলে বিবেচিত। ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও এখানকার মানুষের মৌলিক চাহিদাটুকু যখন পূর্ণ হয় না, যখন খাদ্য সমস্যা থেকেই যায় মানুষের মধ্যে এবং এক শ্রেণির মানুষের জীবন ধারণের রক্তে মজ্জায় অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো তা বহমান গতিতে প্রবাহিত হয়; রাষ্ট্র যখন ন্যায্য অধিকারটুকুও তাদের প্রদান করে না, তাদের দাবি মেটাতে অসমর্থ হয়-তখনই সাহিত্যিকদের ক্ষুরধার কলমের জোরে শানিত হয়ে ওঠে এই সমস্ত সমস্যার নগ্ন রূপটি। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প তথা সাহিত্যের নিবিড় পাঠেও লক্ষ করা যায়, মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা তাঁর লেখনির একটি বিরাট পরিসর জুড়ে রয়েছে। একাধারে সমাজবিজ্ঞানী ও সাহিত্যসেবী মহাশ্বেতা দেবী গভীরভাবে ভেবেছেন মানুষের বাস্তব চাহিদা ও সমস্যাগুলিকে নিঃসরণের কথা। যে ভাবনা বা দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকর্তা বা হোতাদের কিংবা তথাকথিত ক্ষমতা বান পুরুষদের, সেই দায়িত্ব যেন পালন করতে সচেষ্ট হলেন মহাশ্বেতা দেবী-তিনি সোচ্চার হলেন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে সাহিত্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে। তাই অতি সহজেই ভাত, জল, নুন, ঘর, শিশু, অন্ন, বিছন, অরণ্য-এইসব হয়ে যায় তাঁর গল্পের শিরোনাম। এই সমস্ত গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাইলেন স্বাধীনতার এত বছর পরও দেশের মানুষ কীভাবে মৌলিক অধিকারগুলি থেকে আজও বঞ্চিত। এই অর্থে বলা যায়, সত্তরের দশকের শ্রেষ্ঠ কথাকার হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় নিম্নবর্গীয় জীবন সংগ্রামটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উঠে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভূমিহীন, খাদ্যহীন, অবহেলিত, অস্পৃশ্য মানুষ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন সমস্যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি হলেন এক প্রাতিস্বিক ও অপরাজেয় শিল্পী। সমাজে দুর্ভোগের শিকার, অধিকার বঞ্চিত, পরিশ্রমী ও অধিকার দীর্ণ মানুষের কথা সাহিত্যে স্থান দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি ; তাদের প্রাত্যহিক জীবন যুদ্ধের শরিকও হয়েছেন তিনি। তাই এসব সমস্যাক্লিষ্ট, নিম্নবর্গীয়, প্রান্তিক ও ব্রাত্য মানুষগুলির কাছে তিনি ছিলেন মাতৃস্থানীয়া। মাতৃসম দরদী মন ও সহানুভূতিশীল আবেগ নিয়ে তিনি অনাহারী মানুষগুলির প্রতি হওয়া অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন-যা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত।

এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাতেও ('সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফরিয়াদ', 'দারিদ্র্য', 'আমার কৈফিয়ত' ইত্যাদি) অনেক ক্ষেত্রেই মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি নির্যাতিতের প্রতি সমবেদনা সুলভ দরদী মনোভাব, সহানুভূতিমূলক উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই সূত্রে অভিযোগের সুর, সুতীব্র প্রতিবাদ ও সমতার কথা। কিন্তু এতোৎসত্বেও বলা যায় কবিতার মূলে নিহিত থাকে ব্যঞ্জনা-যার মর্ম ভেদ করে কবির আকুতি যতোটা না পাঠক সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি আবেদন কথাসাহিত্য(গল্প-উপন্যাস)-এর মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই অর্থে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি যথেষ্ট প্রাণবন্ত ও শিহরণ জাগ্রতকারী হিসেবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্যতম কারণ হল, জীবনকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তিনি সঞ্চয় করেছিলেন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারার ক্ষমতা বলে। এই প্রেরণাকে উৎস হিসেবে নিয়ে তিনি জীবনের ব্যাখ্যা দান করলেন তাদেরই চোখ দিয়ে, তাদেরই সুরে সুর মিলিয়ে। তবে অবশ্যই তা সম্ভব হয়েছে তাঁর 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'র সুকৌশলজনিত প্রয়াসে।

সমালোচকের ভাষায় বলা চলে, "গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী হয়ে ওঠেন ছোটগল্পের বিস্ময়কর সংযত প্রকরণে শোষক শ্রেণির ব্রাত্যজনের, অন্ত্যজ সংস্কৃতির, হরিজন, আদিবাসী, উপজাতির মৃত্তিকা-প্রোথিত প্রাসঙ্গিকতার নির্ভুল পালাগান রচয়িতা।"[২৬]-এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য এই জন্যই যে এদের ব্যক্তি যন্ত্রণা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে আর তিনি আমাদেরও তাঁর ভাবনার শরিক করে তোলার দায়িত্ব নেন। খাদ্য সমস্যাকে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি তাঁর এই ভাবনার সমভাগী হওয়ার সুযোগ করে দেন পাঠকবর্গকে-যার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য দুটি গল্পই হয়ে ওঠে 'বিন্দুতে সিন্ধু'র দর্শন। —

সূত্র নির্দেশ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, কলকাতা - ৯, পৃ- ৮৮৫
২. মহাশ্বেতা দেবী-শ্রেষ্ঠ গল্প, 'ভূমিকার পরিবর্তে' অংশ, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ- আগস্ট ২০১৬, শ্রাবণ ১৪২৩ ; কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ- ৯-১০
৩. তদেব, পৃ- ১০
৪. বিনীতা রাণী দাস-মহাশ্বেতার গল্পে নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- নববর্ষ ১৪২৪, কোলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ - ১৫
৫. মহাশ্বেতা দেবী-মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দশম পুনর্মুদ্রণ- ২০১৭ (শক- ১৯৩৯), ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি- ১১০০৭০, পৃ - ৩
৬. তদেব, পৃ - ৪
৭. তদেব, পৃ - ৬
৮. তদেব, পৃ - ৬
৯. তদেব, পৃ - ৭
১০. তদেব, পৃ - ৭
১১. তদেব, পৃ - ৭
১২. তদেব, পৃ - ৭
১৩. রূপশ্রী দেবনাথ-দর্পণে নারী গল্পকার : রূপে রূপান্তরে, ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ২০১৫ মার্চ, পশ্চিম ত্রিপুরা, আরগতলা- ৭৯৯০১১, পৃ - ৭০
১৪. প্রতিমা সরকার-'বান : মহাশ্বেতা দেবী', উল্লেখিত উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা)-গল্পচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ- কলকাতা বইমেলা ২০১৮, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ - ১৩০৩
১৫. ড. দেবেশ কুমার আচার্য-গল্প মণিহার, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৪, মাঘ ১৪২০ ; কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ - ৬২৯
১৬. মহাশ্বেতা দেবী-শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রাগুক্ত, পৃ - ২০৯
১৭. তদেব, পৃ - ২১০
১৮. তদেব, পৃ- ২১০-২১১
১৯. তদেব, পৃ - ২১০
২০. তদেব, পৃ - ২১৩
২১. তদেব, পৃ - ২১২
২২. তদেব, পৃ - ২১২

২৩. তদেব, পৃ- ২১৩-২১৪
২৪. তদেব, পৃ - ২১৬
২৫. সুমিতা চক্রবর্তী-'মহাশ্বেতা দেবীর গল্প : ভারতীয় সমাজের শোষণ চিত্র', উল্লেখিত উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও জ্যোতিপ্রসাদ রায় (সম্পা)-ছোটগল্প : বিকাশ, পরিণতি, উপলব্ধি ; সাহিত্য সঙ্গী, পরিবেশক- বামা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২৮ শে জানুয়ারি ২০০৪, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ - ৪৩৯
২৬ . বীরেন্দ্র দত্ত-বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (২য় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ- জুলাই ২০০৪, কলকাতা- ৯, পৃ - ৪৫৯